



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 447 - 453

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রমানাথ রায়ের উপন্যাসে নারীভাবনা : একটি বিশ্লেষণধর্মী অধ্যয়ন

মানসী কুইরী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: manashikuiry1992@gmail.com

0009-0006-5189-7040

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Ramanath ray,
Feminist
Thought,
Patriarchy,
Female Identity,
Alienation and
Loneliness,
Modern Bengali
Novel, Gender
Perspective,
Psychological
Conflict, Rural
and Urban Life,
Social Reality.

Abstract

Literature is the mirror of society—this idea is especially true in the context of Bengali literature. Society is constantly changing, and along with these changes, literature has reflected transformations in human life, thoughts, and emotions. The position of women is one of the most important areas of this transformation. In earlier Bengali literature, women were mainly portrayed as ideal figures shaped by male dependence and patriarchal viewpoints. In contrast, in contemporary literature, women appear as self-aware, protest-oriented, and independent individuals. Writers have presented these changing images of women through their works.

When we compare earlier and contemporary literature, we can clearly see deep changes in women's social position, mental world, sense of freedom, and awareness of rights. From Bankim Chandra to present-day writers, Bengali fiction has continuously discussed women's various problems, and in some cases, ways to overcome those problems. This struggle has continued in literature for a long time, but the question remains—have these problems been fully solved? Perhaps some progress has been made. The miserable condition of women in the past has certainly changed, but the present crisis is different. Today's crisis creates new and more complex challenges for women.

Keeping these contemporary crises in mind, this paper focuses on the varied presentation of women in the novels of Ramanath Ray. Ramanath Ray (3 January 1940 – 15 March, 2021) became popular as an important short story writer of the “anti-establishment” movement of the 1960s. He emerged as a novelist in the 1980s. His first novel was *Chobir Songe Dekha* (Meeting with a Picture, 1980).

In Ramanath Ray's novels, we find a realistic portrayal of the struggles of upper- and middle-class life, economic insecurity, and moral crisis. His works mainly deal with the social, political, and economic tensions of modern urban life, unemployment, broken relationships, conflict between village and city, crisis of values, and women's issues. He portrays the changing

life struggles of married and unmarried women, widows, self-dependent women, housewives, and domestic workers.

Ramanathan Ray also highlights issues such as women's education, workplace participation, politics, reproductive rights, and property rights. He presents contemporary women's food habits and clothing as part of social change. In his writing, female characters no longer silently tolerate injustice; instead, they learn to fight for their rights. He also depicts women facing broken relationships and crises of self-identity. In his novels, women do not accept patriarchy unquestioningly; rather, they challenge it. The writer presents the life crises of modern men and women together and also shows the changing condition of women in the context of village versus city life.

Discussion

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের 'নারী' কবিতায় বলেছেন -

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”

নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের মানবসভ্যতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এগিয়ে চলেছে। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নারী ও পুরুষের যৌথ জীবনযাপন। যদি সৃষ্টির আদিকালের দিকে আমরা একবার ফিরে তাকাই তাহলেই বুঝতে পারব প্রত্যেকটি সভ্যতায় পুরুষের সঙ্গে সমান তালে নারীরা নিজেদেরকে সহযোগী করে গড়ে তুলেছেন। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করলেও নারীরা প্রথম থেকেই বঞ্চিত হয়ে আসছে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, সম্পর্ক ও আত্মপরিচয়ের ধারণাও বদলে যায় এবং সেই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। নারীর অবস্থান ও নারীভাবনার বিবর্তন এই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রাচীন ভারতে নারীশক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। নারীরা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এমনকি ধর্মোচরণের ক্ষেত্রেও সমান অংশগ্রহণ করত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা ও লোপামুদ্রার নাম আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। বেদ উপনিষদের যুগে বৈদিক পুরুষদের সমতুল্য জ্ঞানী ছিলেন ও তর্কে-বিতর্কে এমনকি শিল্প সাহিত্যে ও সংস্কৃতি চর্চায় কোনো অংশে কম ছিলেন না। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, কখনো বা যুদ্ধ বিগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন এই অসাধারণ ঋষিপ্রতিম নারীরা।

আমরা জানি, বৈদিক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের কোনো সাধারণ অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষ সন্তানদের বিদ্যালোভের সুযোগ ছিল। অবশ্য বিদ্যালোভের শুরুতেই ছিল উপনয়ন, গুরুগৃহে বসবাস; কাজেই নারীরা বাদ পড়ে যেত। এরকম একটা নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, উপনয়ন না হলে বিদ্যাশিক্ষা শুরুই হত না। উপনয়ন হত শুধুমাত্র ছেলেদের। মেয়েরা তাই বঞ্চিতই থাকতো। নারীদের স্বাধীনতা সংকুচিত হতে শুরু করে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর থেকে। নারীর জগৎ রান্নাঘর। সন্তানের জন্মদান বা সন্তানের লালন পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি নারীকে তার অধিকার পেতে দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে এবং এই লড়াই এখনও চলছে। সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতি যখন সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠছে তখন স্বাভাবিকভাবেই নারী ও পুরুষ সাহিত্যের চরিত্র হয়ে ওঠে। আমরা জানি, সাহিত্যিকদের কলমে সমকালীন প্রেক্ষাপট ফুটে ওঠে; যা সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি সাহিত্যের আধার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে সমাজে বসবাসকারী নারী ও পুরুষ যে সাহিত্যের চরিত্র হয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিশেষ করে কথাসাহিত্যে ও নাটকে পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রও প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা বাঙালি নারীদেরকে সামাজিক যাবতীয় অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার দায়বদ্ধতা মাথায় নিয়েই নেমে পড়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া প্রথাগত সংস্কার, সামাজিক ধ্যান-ধারণা বা ধর্মের শক্ত গাঁতুনি – যা মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আটপেঁতে জড়িয়ে রয়েছে তাকে উৎখাত করা ততটা সহজ

ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও তাই ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩খ্রি.) উপন্যাসের ‘কুন্দনন্দিনী’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ (১৮৭৭খ্রি.)-এর ‘রোহিণী’কে সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথও নারীকে সেইভাবে সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারেননি। ‘চোখের বালি’র (১৯০৩খ্রি.) বিধবা ‘বিনোদিনী’ ঘর বাঁধতে পারেনি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ণাশ্রম প্রথার মতো অন্যায় কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সমকালীন সমাজকে সরাসরি আঘাত করেন। অচলা, বিজয়া তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য নারীচরিত্র। নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়াই; সেই লড়াইয়ের চিহ্ন এই সময়ের অধিকাংশ লেখকের বিভিন্ন লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই এই লড়াই চলে আসছে তবুও এই সমস্যার সমাধান হয় নি। কিছুটা সমস্যার সমাধান হয়েছে। নারীদের পূর্বের ন্যায় শোচনীয় অবস্থা আর নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের ব্যক্তিগত সংকটের ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। কথাসাহিত্যিক রমানাথ রায়ের উপন্যাসে পরিবর্তনশীল সমাজ ও সেই সমাজে বসবাসকারী নারীদের সমস্যা ও সংকটের বিচিত্র উপস্থাপনার দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

রমানাথ রায় উপন্যাসে সেরকম কোনো বিশেষ তত্ত্বকে উপস্থাপন করেননি। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘ছবির সঙ্গে দেখা’ (১৯৮০খ্রি.) পাঠে দেখা যায়, নারীবাদের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে এসেছে। রমানাথ রায়ের উপন্যাসে নারীবাদের গভীর কোন আলোচনা সেই অর্থে নেই। তবে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা একান্তভাবেই কিন্তু নারীবাদের ভাবনা, চিন্তা চেতনাকে কোথাও না কোথাও ছুঁয়ে যায়। পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া যে রীতি, এই রীতি আসলেই এক ধরনের শোষণ। রমানাথ রায়ের নারী চরিত্রগুলি সেই শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। সমাজ নারীদেরকে যে অবস্থানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এর নির্ধারক আসলে পুরুষতন্ত্র। এই নির্ধারণ কোন ভাবেই কাম্য নয়। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীরা প্রতিবাদের কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে। তারা কোন ভাবেই চাপিয়ে দেওয়া রীতি-নীতি মেনে চলতে চায় না। রমানাথ রায়ের নারী চরিত্রেরা আসলে নারী মুক্তির কথাই বলতে চেয়েছে। ‘ছবির সঙ্গে দেখা’ উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র ছবি। তাঁকে নিয়েই উপন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি। মেয়েরা একত্রিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাঁদের বক্তব্য -

“সমস্ত পুরুষ জাতিকে, সে আমাদের বাবা হোক, ভাই হোক বা প্রেমিক হোক আমরা তাদের ক্ষমা করব না। তাঁদের তৈরি নিয়ম কানুন আমরা ভেঙে ফেলব, মানব না।”^১

উপন্যাসের নারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তাঁদের দাবি আদায় করার এক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রমানাথ রায়ের উপন্যাসের মধ্যে উদারনৈতিক (Liberal Feminism) মার্ক্সীয় নারীবাদ (Marxist Feminism) ও বৈপ্লবিক নারীবাদের (Radical Feminism) কিছু কিছু দিক প্রকাশ পেয়েছে। উদারনৈতিক নারীবাদীদের মধ্যে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা তৈরি হয়েছিল যেখানে নারী পুরুষকে সহচর হিসেবে না ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে শুরু করে অর্থাৎ পুরুষ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার কথা ভাবতে শুরু করে। পুরুষ ও নারী উভয়েই আধিপত্য বিস্তারকারী শোষণকে পরিণত হতে চেয়েছে। রমানাথ রায় উপন্যাসে এই বিপজ্জনক প্রবণতার দিকটি অসাধারণভাবে প্রকাশিত। এক্ষেত্রে সমাজে ও রাষ্ট্রে সার্বিক মঙ্গলের জন্য এমনভাবে সংস্কার প্রয়োজন যেখানে পুরুষ ও নারীর সমান ভূমিকা থাকবে। রমানাথ রায় দেখিয়েছেন নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিকাঠামোর বদল সম্ভব। মার্ক্সীয় নারীবাদ বৈষম্যহীন, শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি করতে চাইলেন। বৈপ্লবিক নারীবাদীদের বিশ্বাস পুরুষতন্ত্র সমাজে নারীদের ওপর সব রকমের শোষণ, পীড়ন, অবদমন ঘটিয়ে চলেছে। বৈপ্লবিক নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের অবসান চান। পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া রীতি এটা একধরনের শোষণ, সেই শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উপন্যাসের নারীরা। তারা কোনভাবেই পুরুষের চাপিয়ে দেওয়া রীতি-নীতি মেনে নেয়নি। উপন্যাসে নারীরা পোস্টার তৈরি করেছেন এবং সেই পোস্টারে লেখা রয়েছে তাঁদের বিভিন্ন দাবি-

“মেয়েদের আর ফ্রিজ, টিভি সেট দিয়ে ভোলানো যাবে না। মেয়েরা আজ স্বাধীনতা চায়। রান্না ঘর মেয়েদের অভিশাপ। রান্নাঘর ভেঙে ফেলো।”^২

অর্থাৎ মেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলেছেন লেখক। তাঁদেরও অধিকার আছে সেই রান্নাঘর থেকে মুক্ত হওয়ার। তাঁরাও চাই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে। তাঁরা আরও জানান -

“ব্রা নেলপালিশ লিপস্টিক ছুঁড়ে ফেলো। পুরুষের কাছে রমনীয় হবার প্রয়োজন নেই।”^৩

এ প্রসঙ্গে সিমন দ্যা বোভোয়ারের ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ বইটির কথা স্মরণে আসে –

“তরুণী, পুরুষের চোখে তাকে কেমন দেখাবে, নিজেকে সেভাবে স্বপ্নে দেখে এবং নারীটি বিশ্বাস করে পরিশেষে পুরুষের চোখেই সে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে।”^৪

অর্থাৎ একজন নারী তাঁকে পুরুষের কাছে নিজেকে তুলে ধরতে হয়। নিজেকে বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্যে সাজিয়ে তুলতে হয়। কেন? কেন ভুলে যায় সে নিজের প্রকৃতি? এমনকি সমাজও চাই নারীকে একটা কামোত্তেজক বস্তু রূপে দেখতে। আধুনিক যুগে ফ্যাশনের দুনিয়ায় মেয়েরা ভুলে যাচ্ছে তাঁদের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা। ভুলে যাচ্ছে ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে বরং তারা হয়ে উঠছে একটি পুরুষের কামনার বস্তু। রমানাথ রায় ঠিক এই জায়গায় এসে আঘাত করেছেন যে, নারীকে রমনীয় হয়ে উঠতে হয় একজন পুরুষের কাছে। তাঁর নারী চরিত্রের তাই তীব্র প্রতিবাদ পুরুষের কাছে রমনীয় হয়ে ওঠার কোনো প্রয়োজন নেই। দুই দলে বিভক্ত হয়ে লেখক আসলে নারীদের নিজেদের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ের যে লড়াই সেই লড়াইকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নারীদের মধ্যে যে একতা নেই তাও স্পষ্ট উপন্যাসে। উপন্যাসে নারীদের মধ্যেই কেউ চাইছে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করতে ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে। নারীবাদী আন্দোলনে নারীরা আন্দোলনকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যায় যেখানে নারী পুরুষের সমকক্ষতাকে ছাপিয়ে উঠতে চেয়েছিল। রমানাথ রায় এই উপন্যাসের নারী ও পুরুষ চরিত্রের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। লেখক নারীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার অধিকারের যে লড়াই সেই লড়াইয়ের ফলে তৈরি সঙ্কটের প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন।

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর যখন নারী বাঁচতে শিখল, শিক্ষার অধিকার পেল, পেল উপার্জনের অধিকার তারপর থেকেই তারা চাইলো পুরুষদের সমান অধিকার। তাঁরাও যে পুরুষদের সমকক্ষ সেই দাবিতে নেমে পড়লেন আন্দোলনে। নারীদের আন্দোলনের এই পরিস্থিতিতে উপন্যাসের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য –

“আমরা তোমাদের ভোটাধিকার দিয়েছি, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি, চাকরির সুযোগ দিয়েছি। শুধু তাই নয়, তোমাদের পরিশ্রম লাঘবের জন্যে গ্যাসের উনুনের ব্যবস্থা করেছি, ফ্রিজের ব্যবস্থা করেছি। এই সঙ্গে তোমাদের প্রতিটি সন্ধে যাতে মনোরম হয়ে ওঠে তার জন্যে টিভির ব্যবস্থা করেছি আর কি চাও?”^৫

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা পুরুষতন্ত্রের দান্তিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মুখ্যমন্ত্রী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পুরুষতন্ত্র এখানে কোনো ভাবেই নারীর এই সফলতাকে মেনে নিতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন থেকেই তা বোঝা যায় ‘আর কি চাও?’ এর মাধ্যমেই লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অধিকার দিনের পর দিন কিভাবে অবদমিত হয়ে এসেছে। নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী করে রাখতে চায় নিজের শাসন কায়মে রাখতে। মুখ্যমন্ত্রী চরিত্রটি তাই বলেছেন –

“তোমরা কি এসবে খুশি নও? তোমরা ভুলে যেও না তোমরা ভারতীয়। সতী, সাবিত্রী, দয়মন্তী তোমাদের আদর্শ। সে আদর্শ ত্যাগ করে তোমরা পশ্চিমের পথ ধরো না। তোমরা শান্ত হও, তোমরা সংযত হও। তোমরা নম্র হও, তোমরা সেবাপরায়ণ হও। মনে রেখ, লজ্জা নারীর ভূষণ। তোমরা ক্রোধ পরিত্যাগ করে সংসার ধর্ম পালন করো।”^৬

লেখক সমাজের গতানুগতিক নিয়ম মেনে চলা সাধারণ মেয়ের আদলে ছবি চরিত্রটি নির্মাণ করেন নি। একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখক নির্মাণ করেছেন ছবিকে, যে একেবারেই আধুনিক। অর্থাৎ পরিবর্তিত সমাজে নারীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন সেই জীবন চিত্রটিকে তুলে ধরাও লেখকের অভিপ্রায় ছিল। ছবি তার নিজের মতো করে সে বেঁচেছে। লেখক এখানে ছবি বা শুধুমাত্র নারীচরিত্রই নয়, পাশাপাশি যে সমস্ত পুরুষ চরিত্র রয়েছে তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। ঔপন্যাসিক ছবি চরিত্রকে যুগপোযোগী করে তুলেছেন, আসলে এর যেমন সুবিধে রয়েছে তেমনই অসুবিধেও রয়েছে প্রচুর। একবছর আগে প্রকাশিত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ‘চড়াই’তে (১৯৭৯ খ্রি:) দেখা যায় নিরুপার কি অবস্থা হয়েছিল অবনীর সঙ্গে নিজেকে আধুনিক করে তুলতে না পেরে। সে আত্মহত্যার পথে পা বাড়িয়েছিল। রমানাথ রায় উপন্যাসে ছবি চরিত্রের মধ্যে দেখালেন এরকম সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষেরা ক্রমশ ওপরে উঠতে উঠতে এমন এক প্রান্তে এসে পৌঁছয় যেখানে পারিবারিক স্নেহ, মমতার বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে যায়। ছবির তথা বর্তমান নারী ও

পুরুষদের এই উত্থান পতনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন লেখক। ছবি সারাদিন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হইহই করে, বাড়িতে তার মন বসে না, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কখন কোথায় যায় তার ঠিক নেই, কখনো সিনেমা, কখনো গঙ্গার ঘাটে যেখানে খুশি সে চলে যায়। ছবি ভালোবাসে আধুনিক সব জিনিসপত্র যা সময়ের সঙ্গে উপযোগী। যেমন নেলপালিশ, লিপস্টিক, সাবান, ডানহিল, জিন ইত্যাদি। কলম, ফুল, কবিতার বই, টেবিল ল্যাম্প, উচ্চাঙ্গ সংগীত, তাঁতের শাড়ি ইত্যাদি সে ততটা পছন্দ করে না। ছবি চরিত্রের মধ্যে এক অবাধ স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের চিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে।

‘ভালোবাসা চাই’ উপন্যাসের মধ্যে লেখক নারী-পুরুষের বিজ্ঞাপনভিত্তিক বিবাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আবেগ, ভালোবাসা, মানবিকতাবোধহীন সম্পর্কে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। নারী বা পুরুষের সম্পর্কের বন্ধন এখন বিশ্বাস, ভালোবাসা, স্নেহ দিয়ে তৈরি হচ্ছে না, সম্পর্কের বন্ধন বর্তমানে তৈরি হচ্ছে অর্থ ও ক্ষমতা দিয়ে। উপন্যাসে একজন মেয়ে তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হিসেবে জানায় -

“ছেলেটি সিগারেট খেত না। যে ছেলে সিগারেট খায় না আমার তাকে একদম ভালো লাগেনা।”^৭

অর্থাৎ লেখক এইভাবে নারীদের ব্যক্তিগত পরিবর্তিত রুচিবোধকে তুলে ধরেছেন। নারী কেবল ভোগের সামগ্রী নয় - এই ভাবনায় উপন্যাসটি শুরু হয়েছে অবশেষে ক্ষমতার কাছে নারী মাথা নত করেছে। লেখক দেখিয়েছেন প্রকৃত মূল্যবোধসম্পন্ন সম্পর্ক বা একে অপরের দায়িত্ব পালন করার চেয়ে নারী ও পুরুষ উভয়েই এখন অর্থ ও ক্ষমতার ক্ষণস্থায়ী প্রভাবকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘ ইতিহাসে যে সমস্ত নারী প্রেমের প্রতিমা বা ত্যাগের মূর্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে রমানাথ রায় বর্তমান নারীর ব্যর্থ প্রেমে প্রতিশোধমূলক আচরণের কথা তুলে ধরেছেন। ‘শ্রীযুক্ত বাসুদেব’ (২০০৩) উপন্যাসে বাসুদেবকে স্বাভাবিক নামের একটি মেয়ে পছন্দ করত, কিন্তু বাসুদেব মেয়েটির প্রেম প্রস্তাব স্বীকার না করায় মেয়েটি বাসুদেবের বিরুদ্ধে শ্লীলতা হানির অভিযোগ এনেছে। ব্যর্থ প্রেমের অভিযোগে আগেকার মেয়েরা চোখের জল ফেলে বাড়িতে বসে থাকতো কিন্তু সময় তাদের সেই জায়গা থেকে বের করে এনেছে। মেয়েটি অপমান বোধ করায় ছেলেটিকে জন্ম করেছে। বাসুদেবের মুখে তাই শোনা যায়-

“আগেকার দিনের মেয়েরা এসব জানতো না তারা কাউকে ভালোবাসতে গিয়ে ব্যর্থ হলে মনের জ্বালা মনে রেখে দিত।”^৮

আগেকার দিন এখন আর নেই সেই দিন বা সেই যুগের অবসান হয়েছে, তারা মুখ খুলেছে তারা প্রতিশোধ নিতে শিখেছে। মেয়েরা এখন বদলাতে শিখেছে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েদের এই পরিবর্তনকেই তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসের মধ্যে লেখক বেশ কয়েকটি নারী চরিত্রের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন যেখানে দেখা গেছে মেয়েরা এখন আর বাবা-মা কে পরোয়া করে না, ছেলে বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে, সিগারেট খায়, প্যান্টসার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীকে নিয়ে আলাদা থাকতে চায়, ছেলেদের মতোই যখন খুশি বাইরে যাবে, আড্ডা দেবে তার স্বামী এতে কিছু বলতে পারবে না; এসব ক্ষেত্রে বাধা আসলে সেই মেয়েরা বধূ নির্যাতনের মামলা করবে, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করবে। মেয়েদের পক্ষেই এখন আইন, তাই তারা অনায়াসে যতখুশি টাকাও ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে। বাসুদেব বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে, বাসু জানিয়েছে -

“মায়েদের যুগ চলে গেছে। সে যুগে কোন মেয়ে কোন পুরুষকে জন্ম করার জন্য শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়ে থানায় গিয়ে তার বিরুদ্ধে শ্লীলতা হানির মিথ্যে অভিযোগ করত না। করতে লজ্জা হত তার আত্মসম্মানে বাধত। এখন তার লজ্জা নেই আত্মসম্মানবোধ নেই।”^৯

লেখক উপন্যাসের মধ্যে অবিবাহিতা চাকুরীজীবী মেয়েদের সংকটের কথাও তুলে ধরেছেন। স্বাভাবিক বয়স আঠাশ বছর। সে বিয়ে করতে চাইছে না তার কারণ তার বাবা-মাকে শেষ বয়সে দেখার কেউ নেই। তাঁর ভাই এখনও কিছু করে না, আর বোন এখনও পড়াশুনা করছে। লেখক নারীদের সেই মানসিক অবস্থাকে, সেইসব সমস্যা তুলে ধরেছেন যা হয়তো সামান্য সমস্যা মনে হতে পারে, কিন্তু সেই বিষয়টিকে নিয়ে যখন আমরা গভীর ভাবে ভাববো তখন আমাদের সমস্যাটি চোখে পড়বে।

রমানাথ রায় মেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদেরও মানসিকতার পরিবর্তনকে খানিকটা দেখাতে চেয়েছেন। বাসু মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজে প্রশ্ন করছে না, সে মেয়েদেরকেও প্রশ্ন করতে বলেছে। মেয়েরা সেখানে প্রশ্ন করছে তাঁদের ইচ্ছে মতো। রানী চরিত্রটি বাসুদেবকে জিজ্ঞেস করেছে, সে যেমন তাঁর বাবা মাকে ছেড়ে থাকবে বাসুকেও সেইভাবেই থাকতে হবে। লেখক অবিবাহিতা নারীর জীবনে বেঁচে থাকার সংকটকেও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। নিনা চরিত্রটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আইন কিভাবে মেয়েদের জীবনের আশীর্বাদ আবার কখনও অভিশাপ হয়ে উঠেছে তাও লেখক উল্লেখ করেছেন উপন্যাসে। মেয়েরা আইনের সমান সুযোগ সুবিধে ভোগ করতে পারছে না। গরিব বাড়ির মেয়েদের জন্য এই আইন নয়, কারণ তারা নির্যাতিতাও হচ্ছে, আইনের সুযোগ সুবিধেও পাচ্ছে না, জমি বিক্রি করে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে তারা, পণ দিয়েও বিয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি প্রসঙ্গকে তুলে ধরেছেন লেখক। অথচ একদল অর্থলোভী মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েরা এই সুযোগ সুবিধে নিচ্ছে। যাদের আসলেই এই আইনের দরকার, যাদের সত্যি সত্যি বিচারের প্রয়োজন তারা এইসব আইন সম্পর্কেই অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। লেখক নিনা চরিত্রটির মাধ্যমে বর্তমান সমস্যা সংকট থেকে বেরোনোর উপায়টিও সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। নিনার প্রথম বিয়ে টিকে নি বাসুদেবের প্রথম বিয়ে টিকে নি। তারা পরে দুজনেই বিয়েও করলো না, রেজিস্ট্রি করলো না, একসঙ্গে নিয়মিত থাকলো না অথচ দু'জনেই মালাবদল করে সারাটা জীবন থেকে গেল। তিনি দেখিয়েছেন রেজিস্ট্রি, প্রতিশ্রুতি দেওয়া, সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি থেকে দূরে থেকেও সুন্দর স্বাভাবিক জীবন কাটানো সম্ভব বরং এসব নিয়ে সমস্যা করার থেকে মানিয়ে নিতে পারলে জীবন সহজ ও সুন্দর হয়।

লেখক বৃদ্ধ বয়সে বাবা মার সহায়সম্বলহীন, নিরাপত্তা ও করুণ দশার কথা উপলব্ধি করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি অনীহা, শিশুর বাড়ি বিমুখ নারীদের সংকটকে তুলে ধরেছেন। লেখক নারী-পুরুষদের আরও একটি সংকটের কথা তুলে ধরেছেন পুত্র সন্তানের প্রতি দুর্বলতা। তাঁরা পুত্র সন্তানকে এখনও বংশের প্রদীপ হিসেবে মনে করেন। তিনি দেখিয়েছেন একজন নারী তাঁর বাবা-মার বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের পাশে থাকতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে যে সমস্ত নারীরা গৃহবধু যারা দীর্ঘদিন ধরে সংসারের বোঝা কাঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, রমানাথ রায়ের উপন্যাসে সেই সমস্ত গৃহবধু প্রশ্ন তুলেছেন। ‘আমরা এখন’ (২০০৪ খ্রি.) উপন্যাসে ইন্দের মা তাঁর বাবাকে বলেছেন -

“আমি কি রাঁধুনি? আগে বোকা ছিলাম, তাই রঁধেছি। আমি রান্না করতে পারব না।”^{১০}

নারী নয় পুরুষদেরও চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ রয়েছে উপন্যাসে ইন্দের বাবা তাঁর মাকে বলা উজ্জ্বিত তা স্পষ্ট -

“আমি ছিলাম বলে তোমার বিয়ে হয়েছে। নইলে তোমার মতো অপদার্থ মেয়েকে কে বিয়ে করত? ...

টেলিফোনের বিল, ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত তোমার নেই।”^{১১}

এখানে যেমনভাবে পুরুষতন্ত্রকে নারীর প্রশ্ন যেন বিদ্ধ করেছে। তাই একই ভাবে নারী চরিত্রটিকে আঘাত করতে ছাড়েনি বাসুর বাবা।

লেখক ‘আমরা এখন’ উপন্যাসে নারীভাবনার এক অন্য পরিচয় তুলে ধরেছেন পাঠকদের সামনে। নারী মনের অন্তরালেই যে সমস্যাগুলো থেকে যায়, হয়তো কোনোদিনই সেসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; নারীদের সেসব সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন লেখক। লেখক পরিবারের ছেলেদেরকেও সংসারের কাজে পারদর্শী করে তুলতে চান। ইন্দ্র ও ইন্দের বাবা দুজনকেই সংসারের কাজে হাত লাগাতে বলেছে ইন্দের মা কিন্তু তারা শোনেনি। কিন্তু ইন্দের মার অনুপস্থিতিতে দুজনই সংসারের কাজ ও অফিসের কাজ তারা করতে পারছে। যে নারীটি গৃহবধু হয়ে দীর্ঘদিন তাঁর কষ্টকে চাপা রেখে সংসারের হাল টেনে চলেছে সেই নারী আর চুপ করে বসে থাকলো না। রমানাথ রায়ের কলমে মেয়েরা প্রশ্ন করতে শিখেছে, নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলেছে। নারীদের নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাও লেখক উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ইন্দের মার কখনও তাঁর স্বামী আবার কখনও তাঁর বাবার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। কিন্তু একটা সময়ের পর সেই নারীও প্রশ্ন করেছে। ইন্দের মা চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠেছে।

লেখক ডিভোর্সি মেয়েদের বর্তমান সংকটকেও তুলে ধরেছেন। তাদেরকে কেউ বিয়ে করতে চাইছে না, বা সেই বাড়িতে যদি কোন বোন থেকে থাকে, সেই বোনের বিবাহ দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের নারী সমস্যা ও সংকটের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন উপন্যাসের মধ্যে। মানবিকতা মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে আজ আর আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে না, পার্থিব চাওয়া-পাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাফল্য সবই বিবেচিত হচ্ছে টাকার মূল্য দিয়ে।

আধুনিক জীবনে কাজের মেয়েদের পরিবর্তিত মানসিক ভুবন তৈরি হয়েছে তা রমানাথ রায় তাঁর উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। ‘সুখ শান্তি ভালোবাসা’ উপন্যাসের মধ্যেও রয়েছে বর্তমান নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ, একজন নারীর সংকট পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি সেকথাও মলি ও রনি চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। রমানাথ রায়ের উপন্যাসে নারীভাবনা কেবলমাত্র সহানুভূতিশীল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নয় বরং তা সমকালীন সমাজ বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণ। লেখক নারীচরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে সমাজের পুরুষতন্ত্রের কাঠামোর ভেতরে নারীর নিঃসঙ্গতার ও অসহায়তার পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তা ও টিকে থাকার শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রমানাথ রায়ের উপন্যাসে নারীভাবনা আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক নতুন সংযোজন। তাঁর নারী চরিত্ররা প্রথাগত আদর্শ নারীর ছাঁচ ভেঙে আত্মসচেতন ও প্রশংসারী রূপে উপস্থিত। উপন্যাসিক বিবাহিত নারীর অসুখী ও নিঃসঙ্গতার চিত্রও তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্ররা সময় অতিক্রম করে আজও পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক।

Reference:

১. রায়, রমানাথ, উপন্যাস সমগ্র, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা ৭০০৯, পৃ. ৮৪
২. উল্লেখ সূত্র - ২, পৃ. ৯২
৩. উল্লেখ সূত্র - ৩
৪. সিমোন দা বোভোয়ার ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১১ পৃ. ২৭৫
৫. রায়, রমানাথ, উপন্যাস সমগ্র, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা ৭০০৯, পৃ. ৮৪
৬. উল্লেখ সূত্র - ৬, পৃ. ৯৬
৭. উল্লেখ সূত্র - ৬, পৃ. ১২৮
৮. উল্লেখ সূত্র - ৬, পৃ. ৪৪৪
৯. উল্লেখ সূত্র - ৬, পৃ. ৪৫৬
১০. উল্লেখ সূত্র - ৬, পৃ. ৫২৭
১১. উল্লেখ সূত্র - ১১